অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। এ শুধু কথার কথা.. .. .. .. ।।

বেশ কিছুদিন থেকেই আমার মনটা খারাপ। মিন্টোতে বাঙালি ললনা নিরুপমাকে হত্যার সংবাদটি জানার পর থেকে মনটা বড় বিষন্ন হয়ে আছে। আমি নিরুপমাকে চিনি না জানি না কখনো দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না। কিন্তু ওর জন্য আমার খারাপ লাগছে। ওর ছোট দুটো বাচ্চার জন্য আরো বেশী খারাপ লাগছে। আমার নিজের বাচ্চা দুটো এখন বাচ্চার বাবা মা হয়ে গেছে। তবুও অনুভব করছিলাম সেই ১৯৯২ সালে যখন ওদের হাত দুটি ধরে এ দেশে এসেছিলাম। আমার চোখে ওদের সেই সময়কার চেহারা ভাসছে - যেন নিরুপমার বাচ্চা দুটো। যখন এসেছি তখন ছেলে মেয়ে দুটো এখানে বাবা মা ছাড়া আর কাওকে চেনে না জানে না। ঠিক মত ইংরেজী বলতে পারে না। কত বড় যে একটা মানসিক আঘাত। দেশে থাকতে বিকেলে আমাদের ক্যাম্পাসে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের সাথে খেলাধূলা ছোটাছুটি। আর এখানে এসে একমাত্র নিত্যসঙ্গী টিভি। যাহোক আমি কষ্ট অনুভব করছিলাম নিরুপমার ছেলে মেয়ে দুটোর কথা ভেবে। সুন্দর ঘুমিয়ে ছিলো। ঘুম থেকে উঠে জানলো মা নেই। আরো জানলো বাবাও নেই। পুলিশ এসে ওদের কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছে না ওরা কী তখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোন খারাপ স্বপ্ন দেখছে কিনা? ওদের পাশে কেউ নেই। ওরা কী পুলিশকে জড়িয়ে কাঁদবে? কে বলে দেবে ওদের মা কোথায়? বাবা কোথায়?

ওদের এ দেশে জন্ম। ওরা বড় হয়েছে ভালবাসার কথা জেনে আদরের কথা জেনে। ওরা তো হত্যা খুন এসবের সাথে পরিচিত নয়। স্কুলে ওদেরকে তো আলোর দিকটাই দেখানো হয়েছে। ওরা তো অন্ধকারের সাথে পরিচিত নয়। ওরা কি প্রলয় শব্দটির সাথে পরিচিত ছিলো কোনভাবে? ওরা যখন জানলো ওদের বাবা ওদের মাকে হত্যা করেছে - ঘুম থেকে জেগে যখন এটা জানলো এবং ওরা যা দেখলো জানলো - ভাবলো এটাই বোধহয় মহাপ্রলয়। ওদের কাছে এ পৃথিবী ক্রমশঃই অপরিচিত হতে থাকলো। জানি না এই সুন্দর পৃথিবীটা আবার কবে ওদের কাছে কিভাবে পরিচিত হয়ে উঠবে।

আমি জানি না আলতাফ কেন তার স্ত্রী নিরুপমাকে খুন করেছে। তবে এটা অনুমান করতে পারি ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সমস্যা চলছিলো। সমস্যা কম বেশী কোন সংসারে নেই? কোথায় যেন পড়েছিলাম - সংসার হলো জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যবর্তী একটা চিকন রশির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। যেখান থেকে যে কোন সময় পড়ে যেতে হতে পারে। এ রশির চারপাশে আছে অভাব অনটন, সুখ শান্তি, হাসি আনন্দ, শোক যন্ত্রনা, আপদ বিপদ, ভয়ভীতি, আশা নিরাশা, তৃপ্তি প্রশান্তি এমন সব কিছু। তাই খুব সাবধানে এই রশি পার হবার নাম সংসার। যে কোন সময় পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কত বড় চ্যালেঞ্জ ভেবে দেখেছেন? সেই রশিটা পার হতে যদি একজন সাথী থাকে তাহলে চ্যালেঞ্জটা নিতে কত সহজ হয়ে যায়। সেই সাথী কখনো পছন্দের বা অপছন্দের হতে পারে, বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের হতে পারে; ভালো অথবা মন্দ হতে পারে আবার কখনো পরম বন্ধু থেকে প্রতারকও হতে পারে। সে যাই হোক সেই রশির উপর দিয়েই তো পার হতে হবে সংসার সীমান্ত।

নিজের ঘরের কথা বলি। সাঁইত্রিশ বছর ঘর করছি। প্রেম করে বিয়ে করিনি। প্রেম করবো কোত্থেকে বিয়ের দশদিন আগে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পারিবারিক পন্থায় তাকে দেখেছি। এই সাঁইত্রিশ বছরেও দেখলাম ওর সাথে আমার বা আমার সাথে ওর কোথাও কোন মিল নেই। খাওয়া পরা রুচি কোন কিছুতেই না। একটা জায়গায় শুধু মিল - আমরা দুজনই গান ভালবাসি। হোক না হোক সুযোগ হলেই দুজনে গান করি গান শুনি। ঝগড়াঝাটি যখন যা হয়েছে বাচ্চাদের কথা ভেবে সব রাগ ক্ষোভ আশা হতাশা বিসর্জন দিয়েছি।

বিবাহিত সংসারে দুটো জীবন। বাচ্চা কাচ্চা হবার আগে এক জীবন এবং ওরা জন্মানোর পর থেকে আরেক জীবন। অর্থাৎ দ্বিতীয় জীবন। আর এই দ্বিতীয় জীবনটাই হচ্ছে প্রথম জীবনের রোমন্থনে সব কিছু উৎসর্গ করা। আরো বিশদ বলতে গেলে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু মানিয়ে নেয়া। যদি একবারেই সম্ভব না হয় তখন আলাদা থাকার বিকল্প খোঁজা যেতে পারে। কিন্তু খুনের চিন্তা মাথায় আনতে হবে কেন? সে জন্য মনঃসতত্ত্ববিদরা বলেন যখনই কোন ডিপ্রেশন বা হতাশা মনের মধ্যে জমাট বাঁধে সেটা কারো না কারো সাথে শেয়ার কর। হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না। আমরা জানি সবার পরিস্থিতি সবার সমস্যা এক নয়। প্রত্যেকটাই ইউনিক এবং অনন্য। তবুও শেষ কথা বলে কিছু নেই। প্রত্যেক বিষয়েরই একটা বিপরিত দিক বা অপশন থাকে। সেটা অন্তত একবার ভেবে দেখা উচিৎ কোন চরম মূল্য দেবার আগে। নিজেদের বনিবনা হচ্ছে না তার মূল্য কেন সন্তানকে দিতে হবে? কেন সন্তানটি মাতৃহারা পিতৃহারা হবে? তার কী দোষ? ব্রোকেন ফ্যামিলিতে বড় হওয়া একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন ওর কী কষ্ট।

আমরা দেশে আমাদের মূল পরিবার থেকে সরে এসে নিজ নিজ গন্ডির মধ্যে নিজ নিজ পরিবার গড়েছি। ভেবে দেখুন এ পর্যন্ত আসতে আমাদের প্রত্যককে কি পরিমান কষ্ট আর স্যাকরিফাইস করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। তার মধ্যে দিয়েই সন্তানদের মানুষ করার চেষ্টা করছি। আমরা কেন সব ছেড়ে এখানে এসেছি? সন্তান সন্ততিদের ভাল রাখবো ভাল পড়াবো সুখে শান্তিতে রাখবো - তাই না? তবে আমরা জ্ঞাতসারে কেন এমন কাজ করবো যে কারণে সেই আদরের সন্তানদের জীবনটা দূর্বিসহ হয়ে ওঠে।

স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ ইচ্ছাকৃত নয় বরং সেগুলো পরিস্থিতির শিকার বলা যায়। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে কি একবার সন্তানগুলোর দিকে তাকানো যাবে না? একটাই তো জীবন। আর তো জন্মাবো না যে যা যা হয়নি যা যা পাইনি সেগুলো ঠিকঠাক করে তারপর আবার অন্য কাউকে নিয়ে জীবন শুরু করবো। তা যদি নাই-ই হয় তবে সেই আলাদাই হবো তবু খুনোখুনি নয়। নিজের সন্তানকে নিজ হাতে এতিম করা নয়। একটা গল্প বলবো। আসলে সে গল্পটা বলার জন্যই এ লেখার অবতারণা। তার আগে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিরুপমার আত্মার শান্তি প্রার্থণা করে নেই। তাঁর কাছে এই রমজান মাসে হাত তুলে প্রার্থণা করছি তিনি যেন মা হারা ওই নিরাপরাধ শিশু দুটোর দায়িত্ব নেন। ওদের সব কিছু সামলিয়ে নেয়ার তৌফিক দেন। আল্লাহ আর যেন কোন সন্তান প্রবাসে এমন পরিস্থিতির শিকার না হয় তুমি আমাদের ক্ষমা করো।

গল্পটায় আসি। আসলে এটা একটা নাটকের গল্প। আমাদের স্কুল -কলেজ জীবনে বিনোদনের একমাত্র উৎস ছিলো রেডিও-ট্রানজিস্টার। তখনো টিভি আসেনি। তো সুযোগ পেলেই রেডিও-ট্রানজিস্টারে গান নাটক গীতিকা অনুরোধের আসর ছায়াছবির গান শুনতাম। নিয়মিত। আকশবানীর নাটকগুলো খুব ভাল লাগতো। একদিন একটা নাটক শুনেছিলাম। নামধাম আজ আর মনে নেই। তবে নাটকের মূল কাহিনীটা আজো মনে আছে। স্বামী স্ত্রীর ছোট্ট একটা সংসার। ধরুন ওদের নাম সুমিত আর শুক্লা। প্রেম করে দুজনে বিয়ে করে ঘর সংসার করছে। দুজনেই চাকরী করে। হিংসে করার মত সুখ ওদের। কিন্ত সে সুখ বেশীদিন গেল না। হঠাৎ একদিন সুমিত রাস্তায় দুর্ঘটনায় পড়ে দুটো পা-ই হারালো। এখন সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সব শুক্লার– অফিস বাজারঘাট সবই। ঘরে হুইল চেয়ারে সুমিতের দিনরাত্রি। শুক্লা তার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করে সুমিতকে হাসিখুশী রাখতে। শুক্লার পৃথিবী এখন অফিস বাজার আর সুমিত। ব্যাস ওইটুকুই। দিন যায়। এর মধ্যে সুমিতের মধ্যে নানা ধরণের শংকা সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। যাকে এক কথায় বলা যায় ইনফিউরিটি কমপ্লেক্স।

শুক্লার সব কিছুতেই সুমিতের সন্দেহ। যদি অফিস থেকে আসতে দেরী হয় তো হাজারটা প্রশ্ন। স্নান করতে গেলে যদি গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে তাতেও সন্দেহ। শুক্লার মনে কী নতুন কোন প্রেম জেগেছে। শুক্লার অফিসে এক অবিবাহিত সহকর্মী আছেন সুমঙ্গল যিনি শুক্লার সার্বিক পরিস্থিতি জেনে ওকে নানাভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। কোন প্রেমফ্রেম নেই তাতে। একদিন প্রচন্ড বৃষ্টির মাঝে সুমঙ্গল শুক্লার বাজারসদাই বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। ভদ্রতা করে শুক্লা সুমিতের সাথে সুমঙ্গলকে পরিচয় করিয়ে দিলো। ব্যাস সুমিতের সন্দেহের পারদ এখন তুঙ্গে। প্রতিদিন এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদ। শুক্লা যতই বোঝায় সুমঙ্গলের সাথে তার সহকর্মীর সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়

তবুও সুমিতের মন মানতে চায় না। ওর অবিশ্বাস তখন চরমে। এদিকে শুক্লা আর পেরে উঠছে না। ও ভাবে সব কিছু স্যাকরিফাইস করে শুধু ওকে ভাল রাখতে চেষ্টা করি তবুও ওর মন পাই না উল্টো খালি সন্দেহ খারাপ ব্যবহার আর গালমন্দ। পরে এক সময় শুক্লা মনে মনে বিদ্রোহ করে বসে। ভাবে এতোই যখন সন্দেহ আর অবিশ্বাস তখন ওর সাথে আর থাকা সম্ভব নয়। একদিন সুমঙ্গলকে সরাসরি প্রস্তাব দেয় - সুমঙ্গল তুমি আমাকে গ্রহণ করো আমি আর পারছি না। ঠিক হলো ওরা ওই শহর ছেড়ে চলে যাবে এবং নতুন শহরে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করবে। ঠিক হলো কোন একদিন ওরা হাওড়া স্টেশনে মিলবে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে গন্তব্যে।

যেদিন শুক্লা যাবে তার আগেরদিন রাতে বিশাল একখান চিঠি লিখলো সুমিতকে। চিঠিটা সুমিতের ওষুধের কৌটার ভিতরে রেখে সকালে নিত্য অফিস যাওয়ার মত করে বেরিয়ে পড়লো। লাগেজটা রাতেই একজায়গায় সরিয়ে রেখেছিলো। বেরিয়ে পড়লো শুক্লা। ষ্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছতেই রাস্তায় দেখলো একটা ছোট্ট ঠেলা গাড়ীতে এক লোক বসে আছে আর এক মহিলা সেই ঠেলাগাড়ি টেনে টেনে ভিক্ষা করছে। শুক্লাকে দেখে মহিলাটি বললো - মাগো দুটো ভিক্ষে দেন গো। বড্ড কষ্টে আছি। শুক্লা দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো তুমি কাকে টেনে টেনে ভিক্ষে করছো? শুক্লা কথা বলছে আর ব্যাগ খুলে টাকা বের করছে মহিলাকে দেবে বলে। মহিলা বললো ও আমার স্বামী। পঙ্গু। ওকে রেখে কোথাও যেতে পারি না। মলমূত্র সবই আমাকে করাতে হয় তাই বাধ্য হয়ে ভিক্ষে করছি। পারলে একটু সাহায্য করেন। শুক্লা জিজ্ঞেস করলো তুমি ওকে এভাবে কতদিন টানছো? বললো এককুড়ি বছর। এ-ক-কু-ড়ি-ব-ছ-র শুক্লা মনে মনে বলে। তো তুমি কতদিন ওকে এভাবে টানবে। কী যে বলেন দিদি আমার স্বামী না? আমি ছাড়া ওর কেউ নেই ও ছাড়া আমার কেউ নেই। যে ক'দিন বাঁচি একসঙ্গেই থাকবো। শুক্লার মাথাটা কেমন যেন চক্কর মেরে উঠলো। মনে হচ্ছে এখনই পড়ে যাবে। ভাবছে ও যদি কুড়ি বছর সইতে পারে আমি কেন দু বছরেই অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। আমি ছাড়া সুমিতের তো আর কেউ নেই। কোনমতে এক মুঠো টাকা যাই এসেছে হাতে মহিলাকে দিয়ে স্টেশনে না গিয়ে বাড়ির পথে আবার হাঁটা শুরু করলো। বার বার বিড় বিড় করে বলছে - ও যদি এককুড়ি বছর পারে আমি কেন পারবো না।

ঘরে ঢুকে দেখে সুমিত তখন অসহায়ের মতন হুইল চেয়ারে ঘুমোচ্ছে। চিঠিটা তখনো সেই ওষুধের বাক্সে যা তখনো সুমিত পড়ে নি। শুক্লা অনেকক্ষণ সুমিতের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় যেন ঝাঁপ দিয়ে সুমিতের বুকের মধ্যে পড়লো। ওকে জাপটে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে আর বলছে - আমায় ক্ষমা করো সুমিত আমায় ক্ষমা করো।